ভ্যাট বিভ্রাট ও শিক্ষা ব্যবস্থার অর্থনীতি

ড. এ কে এনামুল হক

ভ্যাট নিয়ে হঠাৎ করেই যেন বিস্ফোরণ। যে শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনীতিতে কখনো নাক গলায়নি, তারাই শত রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতায়ও ধৈর্য ধারণ করে পড়াশোনায় রত ছিল, তাদের হঠাৎ করেই রাস্তায় নামিয়েছে ভ্যাট। আমার এক সহকর্মী বলছিলেন, যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ চড়াও হয়েছিল, সেদিনও নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ শিক্ষকরা ছাত্রদের রাস্তা বন্ধ করে বসার বিপক্ষে ছিলেন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো গাড়ি ভাংচুর করেনি, পুলিশের ওপর চড়াও হয়নি, নীরবে প্রতিবাদ করছিল বিষয়টির। পুলিশের চাপ এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীরা একে একে রাস্তা ছেড়ে যখন ক্যাম্পাসে ফিরে আসছিল, ঠিক তখনই পুলিশ রাবার বুলেট ছোড়ে। আমার এক সহকর্মী কর্মকর্তা প্রায় ১৬টি বুলেট বিদ্ধ হয়ে আহত হন। আহত হয় বেশ ক'জন শিক্ষার্থী। যাদের ছবি পত্রিকায় বা টিভিতে স্থান পেয়েছে। এই ঘটনা কাম্য ছিল না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ভ্যাট প্রত্যাহার করা হলেও সারা দেশে এ ক'দিন বিভ্রান্তির অন্ত ছিল না। এনবিআর প্রথমে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বলা হয়, ভ্যাট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করার স্বার্থে জানিয়েও দেয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই ভ্যাট দেবে। পরদিন অর্থমন্ত্রী বিষয়টি খোলাসা করেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেবল এ বছরই ভ্যাট দেবে। আগামী বছর থেকে শিক্ষার্থীরা দেবে। বিষয়টি আরো ঘোলা হয়। তাই এনবিআর অনেক ভেবেচিন্তে আরো একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর বলে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য' গ্রহণ করে থাকে, ফলে ভ্যাট বিশ্ববিদ্যালয় দেবে। ভ্যাট চালুর আগেই ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য কী করে হয়, তা কারো মাথায় আসে না। তাই আবারো সবাই অবাক হয়। ভাবতে থাকে আমরা বোধহয় হবুচন্দ্র রাজার দেশেই বাস করছি। একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রীও নতুন ব্যাখ্যা দেন, ভ্যাটের টাকায় দেশে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সব মিলিয়ে এক অগোছালো সরকার, কিম্ভূত অবস্থা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবাদ মনে পড়ে। কথায় বলে এক মিথ্যাকে ঢাকতে শত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিংবা বলা যায় সরকার এতগুলো ব্যাখ্যা দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করছে। ফেসবুকেও নতুন নতুন কৌতুক এসেছে। একটি কৌতুকে বলা হয়েছে, 'ভ্যাট দেবে ছাত্র নয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ' এর মানে 'দুধ দেবে খামারি নয় পশু মন্ত্রণালয়'। কৌতুক কৌতুকই। অবশেষে সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে বোধোদয় হয়। ভ্যাট তুলে নেয়া হয়। অর্থমন্ত্রীর এ ভ্যাটনীতি নতুন নয়। এর আগেও চেষ্টা করেছেন। আগামীতেও করবেন বলে ধারণা। ভ্যাট বিষয়ক এতসব বৈপরীত্যের কারণে আমাদের উচিত বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট করা।

প্রথমত, এটা অনস্বীকার্য যে, সরকারের কোষাগারে অর্থের প্রয়োজন অনেক। এ সত্য অস্বীকার করার জো নেই। কেন এ অর্থের প্রয়োজন? কারণ সরকার তার কাজটি করতে পারছে না অর্থের অভাবে। বিষয়টি আজকের নয়, বহু পুরনো। কারণ আমরা করদাতা খুঁজে পাচ্ছি না। গাড়ি পাচ্ছি, বাড়ি পাচ্ছি, ক্রেডিট কার্ডধারী পাচ্ছি, কিন্তু করদাতা পাচ্ছি না। এতে সরকার বাধ্য হয়ে হয় সীমিত সংখ্যক করদাতার ওপর চাপ বাড়াবে, অন্যথায় সরকারি খরচ কমাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণেই আসি। প্রতি বছর সাত-আট লাখ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়গামী হয়। সরকারের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ক'জন ভর্তি করে? ৫০-৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। নব্বইয়ের দশকে প্রতি বছর ৭০-৮০ হাজার শিক্ষার্থী কেবল ভারতেই যেত উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য। দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বের হয়ে যেত তাদের জন্য। বর্তমানে একই অবস্থা স্বাস্থ্য খাতে। প্রচুর রোগী বিদেশ যায় চিকিৎসার জন্য। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে দেশে এখন বহু বিদেশী কাজ করে। প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে যায় প্রতি বছর তাদের জন্য। শুধু তাই নয়, বিদেশ থেকে ভারতে প্রেরিত অর্থের পঞ্চম বৃহত্তম জোগানদাতা দেশ এখন বাংলাদেশ।

নব্বইয়ের দশকে বিদেশে পড়ার প্রবণতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করা হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকার বুঝতে পারল, দেশে পর্যাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলে পিতামাতা সন্তানকে ঘরে বসিয়ে রাখবে না। তাই সরকার শিক্ষা খাতে সামাজিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে দিয়েছিল কর রেয়াত সুবিধা। অর্থাৎ যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা খরচ করবে, তাদের সেই অর্থ করমুক্ত করা হবে। বুঝতেই পারছেন, সরকার অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, কর রেয়াত দিয়েও যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে; তা প্রকারান্তরে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এর দ্বারা সরকারের দায়িত্ব প্রকারান্তরে অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়া হলো। এখন থেকে এ দেশে দুই ধরনের অভিভাবক থাকবেন। একদলের ছেলেমেয়েরা সরকারি খরচে, কম খরচে বা সরকারি খরচে উচ্চশিক্ষা পাবে (সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) অন্য দলের ছেলেমেয়েরা পিতামাতার খরচে উচ্চশিক্ষা পাবে। সরকারের ব্যয় সাশ্রয় হবে। এতগুলো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে না। প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে সরকারের খরচ হয় বছরে প্রায় ১ লাখ টাকা। যদি জমি ও অন্যান্য স্থাপনার স্থিতি খরচ যোগ করা হয়, তবে এ খরচ আরো বেশি হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের প্রায় অর্ধেক সরকারি আর বাকি অর্ধেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বুঝতেই পারছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের উচ্চশিক্ষার খরচ প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে।

দ্বিতীয়ত, সরকার ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বাজেটের আকারও বড় হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী প্রতি বছরই নিজের রেকর্ড নিজেই ব্রেক করছেন। আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের দায়দায়িত্ব খোদ অর্থমন্ত্রীর ওপর বর্তায়। ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প ৫ হাজার কোটিতে শেষ হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা তছরুপ হচ্ছে। কেউ শাস্তি পাচ্ছে না। দায় বাড়ছে করদাতাদের। আবার প্রত্যক্ষ করদাতা বা আয়করদাতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না (কেউ কেউ মনে করে খুঁজতে চাচ্ছে না)। তাই পরোক্ষ করা বা ভ্যাট বসছে বিভিন্ন খাতে। স্কুল-কলেজ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, সবই পরোক্ষ করের আওতায় আসছে। দেশে বসবাস করে মানুষ যেন ঠকছে। অর্থশাস্ত্রে পড়ানো হয় পরোক্ষ কর অর্থনীতিতে ভালো নয়। কারণ তার ভার শেষ পর্যন্ত পড়ে গরিব ও মধ্যবিত্তের ওপর। বিষয়টি কি আমাদের জানা নেই? তৃতীয়ত, ভ্যাট প্রচলনের বছরটিকে কি মনে পড়ে? সরকার যখন ভ্যাট প্রচলন করছিল, তখন তুমুল আপত্তি এসেছিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তখন বর্তমান সরকার বিরোধী দলের অবস্থানে এবং তখন তারা আন্দোলনে ব্যবসায়ীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বাধ্য হয়ে সরকার তখন বলেছিল, ভ্যাট দেবে ভোক্তারা অর্থাৎ বাজার মূল্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। বিক্রেতারা ইচ্ছা করলে তাদের পণ্য মূল্য ভ্যাটবহির্ভূত মূল্য হিসেবে ঠিক করবেন। তাই তখন থেকেই ক্রেতা পণ্যের মূল্যের ওপর সংযোজিত ভ্যাট দিয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালে এনবিআর একটি প্রচারণা চালায়, যার সারবস্তু ছিল, ক্রেতারা যেন পণ্য কেনার সময় ভ্যাট রশিদ চেয়ে নেয়। শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে অর্থমন্ত্রী এ ব্যাখ্যা পাল্টিয়েছেন। বলছেন, মূল্য সংযোজন কর এখন থেকে বিক্রেতারা দেবে। বক্তব্যটা কতটা বিবেচনাবহির্ভূত তার ব্যাখ্যা থাকা দরকার। এহেন বক্তব্য সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারত। আগামী দিনে ক্রেতারা যখন বলতে শুরু করবে যে, আমার বিদ্যুৎ বিলের ভ্যাট সরকার দেবে। আমার ওয়াসার বিলের ভ্যাট সরকার দেবে। আমার ফোনের বিলের ভ্যাট ফোন কোম্পানি দেবে। আমার বিমান টিকিটের ভ্যাট বিমান দেবে। তখন মাত্র ১০০ কোটি টাকা জায়েজ করতে গিয়ে যে ফাঁদ তৈরি করা হয়েছিল, তার দায় সরকারকে বহন করতে হতো বহুদিন। এজন্যই ইংরেজি বলে স্পেইড কে স্পেইড বলাই ভালো কিংবা বাংলায় বলে অতিচালাকের গলায় দড়ি।

চতুর্থত, এ ধারণা স্বাভাবিক যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করেন। তবে এ ধারণা অমূলক যে, তারা সবাই কোটিপতি। কোটিপতির সন্তানরা কিংবা আমাদের অধিকাংশ রাজনীতিবিদের সন্তানরাও এখন আর দেশে পড়াশোনা করে না। সুতরাং কোনো ভ্যাটই তাদের ওপর বর্তাবে না। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বলছিলেন, তাকে কেউ একজন গর্বভরে বলেছেন যে, তিনিই নাকি উচ্চশিক্ষার ওপর ভ্যাট আরোপের বুদ্ধি অর্থমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন। তিনি পেশায় একজন ফিন্যান্স বিশেষজ্ঞ। বিষয়টি জানার পর আঁতকে উঠলাম। কারণ পাবলিক ফিন্যান্স বিষয়টি অর্থনীতিতে পড়ানো হয়, অন্য কোথাও নয়। ফিন্যান্স আর ইকোনমিকস এক নয়। তার পক্ষে পাবলিক ফিন্যান্স বিষয়ে বেশি ভেতরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তার বুদ্ধিতেই কি আমাদের এ অবস্থা? বহুবার বলেছি, সরকারের বিবেচনা বৃদ্ধি করার জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল থাকা উচিত। মন্ত্রীদের উচিত বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে পরামর্শ করে নীতি প্রণয়ন করা। কিন্তু এই প্রথম জানলাম অর্থমন্ত্রীর মন্ত্রণাদাতা আছেন। যাহোক, সাংবাদিক বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তার ছেলেমেয়েরা কি এ দেশে পড়াশোনা করে? উত্তরে বললেন 'না'। সাংবাদিক বন্ধু অবশ্য আমাকে তার নাম বলেননি।

যাহোক, কোটিপতি না হলেও আমাদের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের মধ্যে নানা রকম লোক রয়েছেন। কেউ সরকারি চাকরিজীবী। কেউ বেসরকারি চাকরিজীবী। কেউ উচ্চবিত্ত, কেউ মধ্যবিত্ত। আমরা এমন ছাত্রও পাই, যাদের পক্ষে সেমিস্টার ফি দেয়াই কষ্টকর হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেই। কিছুদিন আগে আমাদের এক ছাত্রী এসে জানাল, তার পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তার অবস্থা সংক্ষেপে এই রকম— তার মা গৃহিণী। বাবা তাদের দেখাশোনা করেন না। মায়ের একটি বাড়ি ছিল, যার ভাড়া থেকে তাদের সংসার ও পড়াশোনা চলত। সম্প্রতি একটি ডেভেলপার কোম্পানিকে তারা বাড়িটি দিয়েছেন। কোম্পানি জায়গার দখল নিয়েছে, কিন্তু অর্থ দিচ্ছে না। সে চোখে অন্ধকার দেখছে। তার অবস্থা শুনে আমরা গ্রামীণফোনকে বলে তাকে এক কল সেন্টারে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলাম। বললাম, দিনে ৬ ঘণ্টা কাজ করে যে অর্থ পাবে, তাতে তোমার পক্ষে বেতন দেয়া সম্ভব হবে। বহুবার শিক্ষকরা চাঁদা তুলে দিয়েছে বিপদগ্রস্ত ছাত্রের বেতন দিয়েছি। আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেয়ার জন্য তদবির করেছি। এরাই তো আমাদের ছাত্র আর আমরা তাদের শিক্ষক। তবে হ্যাঁ, আয়কর দিতে পারেন এমন অভিভাবকের সংখ্যাও অনেক। আমার ধারণায় তাদের অনেকেই আয়কর দেন। আর তারা যদি আয়কর না দেন, তবে সরকার সহজেই অগ্রিম আয়কর ছাত্র বেতন থেকে আদায় করতে পারত। বিষয়টি মানবিক হতো এই কারণে যে, যারা কর দেন, তারা অগ্রিম কর পরবর্তীতে সমন্বয় করতে পারতেন আর যারা দেন না, তাদের কর নিবন্ধনের আওতায় আসতে হতো। বলতে পারেন, যাদের আয় করযোগ্য নয়, তাদের কী হবে? সহজ সমাধান হলো, সেক্ষেত্রে তারা কর নাই— এমন সার্টিফিকেট এনবিআর থেকে আনলে তাদের জন্য অগ্রিম কর কর্তন করতে হবে না, এ নিয়মও চালু করা যায়।

পঞ্চমত, কেউ কেউ মনে করছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টাকার পাহাড় বানাচ্ছে। ফলে তাদের কাছ থেকেই কর নেয়া উচিত। আমার জানা মতে, এ দেশে সব অলাভজনক প্রতিষ্ঠানই তাদের উদ্বৃত্ত থেকে কর দেয়। এ কর প্রায় ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ এ রকম কর বর্তমানে চালু আছে। ফলে এটা ভাবা অন্যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো কর দেয় না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবশ্য এ নিয়মের আওতায় নেই। তবে একই সঙ্গে এ কথাও বলে রাখা ভালো, ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই কিন্তু উদ্বৃত্ত রাখতে পারে না। ভালোগুলো ছাড়া বাকিগুলোর পক্ষে নিয়মিত শিক্ষকের বেতন দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নয়, এমন ব্যক্তি 'অধ্যাপক' হয়ে যাচ্ছেন। আরেকটি বিষয় নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে, তা হলো— অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রায় ২০ বছর পরও তাদের নিজেদের ক্যাম্পাসে যেতে পারছে না। এর কারণ তাদের উদ্বৃত্ত অতটা হয় না। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ক্যাম্পাস তৈরির জন্য সারচার্য আরোপ করেছে, কেউ কেউ বিপুল ঋণ নিয়েছে ক্যাম্পাস তৈরি করতে। এসব বিষয়ে স্বচ্ছতার প্রশ্ন থাকতেই পারে, তবে তা দেখার ভার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের, অর্থমন্ত্রীর নয়। তার দায়িত্ব নয় বিষয়টিকে উসকে দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। বলা বাহুল্য, এ ধারণা অবান্তর যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টাকার পাহাড় তৈরি করেছে। একটু পরিপক্ক হলে বোঝা যায় যে, ক্যাম্পাস তৈরি করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলো ঋণের পাহাড়ও গড়তে পারে আর তা করা হলে শেষ পর্যন্ত দায় সরকারের ঘাড়েই পড়বে। একই সঙ্গে জেনে রাখা ভালো, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাথাব্যথা হচ্ছে কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিগগিরই নিজেদের ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না, তা নিয়ে। একই সঙ্গে মঞ্জুরি কমিশন বলছে, ক্যাম্পাসে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নতুন বিষয় খোলা হবে না। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! ডিগ্রির বিষয় না বাড়ালে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়বে না। শিক্ষার্থী না বাড়লে আয় বাড়বে না। আয় না বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে না। সঞ্চয় না বাড়লে ক্যাম্পাস হবে না। অন্যদিকে বেতন বাড়ালে ভালো ছাত্র পাওয়া যাবে না। ভালো ছাত্র না পাওয়া গেলে ভালো শিক্ষক আসবে না। ভালো শিক্ষক না থাকলে শিক্ষার মান বাড়বে না। শিক্ষার মান না বাড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়বে না। আয় না বাড়লে সঞ্চয় হবে না। হবে না ক্যাম্পাস। কোথা দিয়ে কী হবে, তা কেউ জানে না। ফলে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের অবস্থার আর উন্নয়ন করতে পারছে না। আমরা ২০ বছর যাবৎ ঘুরপাক খাচ্ছি অন্ধকার গলিতেই। কেউ জানে না কিসে মুক্তি! আমাদের কিন্তু আসলেই জ্ঞানের অভাব! পৃথিবীর বহু দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার জমি পর্যন্ত দান করে ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য। তারা তো সরকারকে সহায়তাই করে।

ষষ্ঠত, কেউ কেউ এমন উপদেশও দিয়েছেন যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন ভ্যাট দেয়ার নাম করে বেতন না বাড়ায়; তার তদারকি যেন ছাত্ররা করে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে বলে একটি কথা আছে। বিষয়টি তেমনি। বেতন কখনো কমে না। এটা ধ্রুব সত্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কেন বেতন বাড়ায়, সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া উচিত বলে মনে করি।

১. সরকার বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পেট্রল প্রভৃতির দাম বাড়ালে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বাড়ে। ২. ক্যাম্পাস তৈরিতে নির্মাণসামগ্রীর দাম বাড়লে খরচ বাড়ে। ৩. সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ালে তার চাপ বেসরকারি খাতেও পড়ে। তাদেরও প্রয়োজন পড়বে বেতন বাড়াতে। তাতে খরচ বাড়বেই। ৪. শিক্ষার মান ধরে রাখার অন্যতম উপায় ভালো শিক্ষক ও উপযুক্ত পরিবেশ। বেতন না বাড়িয়ে কি তা সম্ভব? অতএব বেতন ভবিষ্যতে বাড়বে এটা অনস্বীকার্য। বরং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বেতন না বাড়ানোর ফলে শিক্ষকদের বেতন দিতে সরকার হিমশিম খাচ্ছে আর অর্থমন্ত্রী আবোলতাবোল বক্তব্য দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে। অথচ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যভাবে বক্তব্য দিয়ে যেভাবে বিষয়টিকে দেখতে বলা হলো তাতে ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি দাঁড় করানো হলো। বিষয়টি ভালো হলো না।

সবশেষে শিক্ষা ব্যবস্থাই অর্থনীতির চালক। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। লাখ লাখ ছাত্র শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হবে না। সরকারের দায় ও দেনা আরো বাড়বে। অন্যদিকে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা জন্ম দেয় নতুন করদাতার। বৃদ্ধি করে উৎপাদন ক্ষমতা। উচ্চশিক্ষাকে তাই আমরা দেখি আগামী দিনের করদাতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে। সারা পৃথিবীতে এটাই নিয়ম। আর আমরা হাঁটছি উল্টো পথে।

শিক্ষা ব্যবস্থাই অর্থনীতির চালক। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। লাখ লাখ ছাত্র শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হবে না। সরকারের দায় ও দেনা আরো বাড়বে। অন্যদিকে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা জন্ম দেয় নতুন করদাতার। বৃদ্ধি করে উৎপাদন ক্ষমতা। উচ্চশিক্ষাকে তাই আমরা দেখি আগামী দিনের করদাতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে। সারা পৃথিবীতে এটাই নিয়ম। আর আমরা হাঁটছি উল্টো পথে।

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা